সংবাদ

তারিখ ... ১১.৮.৮৪ ...
পৃষ্ঠা ... ৫ কলাম ... ৫ ...

019

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার : প্রাসংগিক

মুহম্মদ আবদুস সাত্তার

ন'মাসের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের ফলশ্রুতি বর্তমান বাংলাদেশ একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র। কিন্তু এর ইতিহাস সুদীর্ঘকালের, বিশেষতঃ সাহিত্য–সংস্কৃতি–সভ্যতার ইতিহাস। পুঁথি-পুস্তককে ভালবাসার ইতিহাস। শিলালিপি পঠন-পাঠনের কাহিনীও বেশ সমৃদ্ধ।

পুস্তকপ্রেমীদের সন্ধান পাওয়া যায় চীন থেকে যখন কাশ্মীর ও গিলগিটে কাগজের ব্যবহার শুরু হয়। তালপাতা ও ভূর্জপাতা লেখার উপকরণ হয়। ব্যক্তিগত পর্যায়ে বই সংগ্রহ গড়ে উঠেছিল। কালের বিবর্তনের পাশাপাশি অধিকাংশই বিলুপ্ত হয়ে যায়। সরকারীভাবে এদেশে গ্রন্থাগার গড়ে ওঠে উনবিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে। উইলিয়াম কেরী ও পঞ্চানন কর্মকারের প্রচেষ্টায় বাংলা মুদ্রণ উন্নয়নের সাথে সাথে পুস্তক প্রকাশের গতি ব্যাপ্তি লাভ করে। সে সময়ই ইংরেজ রাজশাসকরা এদেশে গ্রন্থাগার স্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করে। তা যদিও নিজেদের স্বার্থের সাথে সম্পৃক্ত ছিল। কিন্তু তবুও এদেশে উন্নত জ্ঞান প্রসারের পদক্ষেপ শুভ ছিল বৈকি। একটা সদিচ্ছা অন্ততঃ কাজ করেছিল যে, এদেশের কিছু মানুষ শিক্ষিত হবে।

উল্লেখযোগ্য যে, তদানীন্তন সময়ে স্থাপিত অধিকাংশ গ্রন্থাগারই বর্তমান বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্ত। সৌভাগ্যের জোরই বলতে হয়। তবে তাদের ভগ্নদশায় আজ করুণার উদ্রেক হয়। অতঃপর বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে কতিপয় গণ-গ্রন্থাগার ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়। ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সাথে সাথে গ্রন্থাগারের যাত্রা আরম্ভ। শুরু থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অখণ্ড অংশ হিসেবে দিনে দিনে উন্নতি ও সম্প্রসারিত হয়।

গ্রন্থাগার একটি বর্ধিষ্ণু কর্ম ও গতিশীল প্রতিষ্ঠান। সময়ের অগ্রগতির সাথে সাজুয্য রেখে এর বৃদ্ধিপ্রাপ্তি ঘটে। ঐতিহাসিক দিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার প্রাচীন গ্রন্থাগারগুলোর একটি অন্যতম ও সর্ববৃহৎ নিঃসন্দেহে। যাত্রার শুরুতে বিশেষ চাকচিক্য এবং শ্রী বর্ধিত হয়ে থাকলেও তা ক্রমান্বয়ে স্তিমিত হতে থাকে। বিশেষতঃ একটি নতুন জাতির জরুরী অবস্থায় অত্যন্ত জরুরী প্রয়োজন হচ্ছে এর আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন সাধন। নতুন করে উচ্চশিক্ষা ও শিক্ষায়তনের গুরুত্ব উপলব্ধির পাশাপাশি বর্তমান-গুলোর উন্নয়ন সাধন অপরিহার্য। এ সব ক্ষেত্রে সুষ্ঠু পরিকল্পনার ভিত্তিতে নীতি নিরূপণ, সমস্যার সমাধান, নিয়োগ ও ব্যয়ভার বহনের বিষয়টি বিবেচ্য। যেহেতু বিশ্ববিদ্যালয় মানকল্পের উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রধান বিনিয়োগের প্রতিনিধিত্ব করে। কার্যতঃ বিশ্ববিদ্যালয় নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য অনুযায়ী সংগঠিত হয়, উন্নতি লাভ করে এবং পরিচালিত। বিশ্ববিদ্যালয় জাতির ঐতিহ্য তথা সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও প্রয়োজনীয়তাকে তুলে ধরবে। মানব সম্পদকে প্রায়োগিক ক্ষেত্রে উৎকর্ষময় করে তুলবে। গ্রন্থাগারের ভূমিকা হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের লক্ষ্য ও প্রয়োজনীয়তাকে সফল করার জন্যে বাস্তবানুগ কর্মপদ্ধতির ভিত্তিতে আদর্শ সেবাদান করা। অর্জিত সম্পদের দ্বারা আত্মিক সহায়তাদান করা।

কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার বিশ্ববিদ্যালয়ের মৌলিক উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে কতটুকু সফল হয়েছে? সম্প্রতি বাইসেন্টিনিয়েল হলে আমেরিকান ফুলব্রাইট প্রফেসর মার্শাল ডব্লিউ, ফিসউইক মন্তব্য করেন যে, বাংলাদেশ ফাইভ ষ্টার হোটেল পরিচালনা করতে পারে অত্যন্ত সুনিপুণ উপায়ে। সেখানে পর্যাপ্ত আলোর ঝলসানি প্রত্যক্ষ করা যায়। কিন্তু জাতীয় সভ্যতার কৃষ্টির ধারক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের মত একটি গ্রন্থাগারের রক্ষণাবেক্ষণ করা সম্ভব হচ্ছে না। অন্ধকারে যেনো ছেয়ে আছে। এটা অত্যন্ত লজ্জাস্কর ব্যাপার। তার উক্তিতে হয়তো আমরা বিরক্ত বোধ করতে পারি। এটা অত্যন্ত সত্য যে, জাতির সাহিত্য-সাংস্কৃতি-ইতিহাসের ধারক ও সংবাহক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের মত একটি গ্রন্থাগারও অনাদরে লালিত। এর সুষ্ঠু পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা নেই। এই অবহেলার কি কারণ তার কোন সহজ ব্যাখ্যাও নেই। তবে এই ব্যাখ্যার পরিপূরক হিসেবে উক্ত নিবন্ধকারের ১৯৭৭-৭৮ শিক্ষা বছরে এক গবেষণা জরিপে বর্তমান করুণ অবস্থা প্রত্যক্ষ করা যায়। সেটা একইভাবে ডঃ ফিসউইক-এর উক্তিতে পুনরায় মূর্ত হয়ে উঠেছে। অত্যন্ত স্বাভাবিক যে, এই অন্ধকারাচ্ছন্নতায় একদিন সমগ্র জাতিই অন্ধ হয়ে যাবে। বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের এই দুরবস্থার জন্যে মূলতঃ কতক বাধা-বিপত্তি ও আনুষংগিক কিছু অসুবিধাই কাজ করছে। নিবন্ধকার তার গবেষণাপত্রে সেগুলো তুলেও ধরেছিল। তৎকালীন উপাচার্যের অনুমতি সাপেক্ষে উক্ত গবেষণা পরিচালিত হয়েছিল। কিন্তু কোন প্রতিকার হয়নি। আমেরিকান ফুলব্রাইট প্রফেসর ফিসউইকের উক্তিতে এবার যদি কর্তৃপক্ষ কিছু সজাগ হন, তা হলে জাতি উপকৃত হবে।

পৃষ্ঠা ... ৮ কলাম ... ৮

কিছু কথা

যেহেতু, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার বাংলাদেশের জাতীয় গ্রন্থাগারের প্রতিনিধিত্ব করছে; এটাকে সুষ্ঠুভাবে গড়ে তোলা জাতির প্রচেষ্টা থাকা উচিত। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় ও এর গ্রন্থাগারের উদ্দেশ্য ও উভয়ের সম্পর্ক, পাশাপাশি গ্রন্থাগারের সাথে জাতির কি সম্পর্ক, তা ই যদি জাতির কাছে পরিষ্কারভাবে বোধগম্য না হয়, তা হলে দুঃখ রাখার আর জায়গা কোথায়। সম্ভবতঃ এটাই সবচেয়ে বড় অন্তরায় যে, একটি গ্রন্থাগার একটি জাতির কি প্রয়োজনে আসতে পারে, সে সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণার অভাব।

তাছাড়াও, গ্রন্থাগারের করুণ ও লজ্জাস্কর পরিণতির জন্যে যা অন্তরায় তা হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও অনুষদীয় সদস্যদের সহযোগিতার অভাব এবং গ্রন্থাগার বিষয়ক নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে মতপ্রার্থক্য ও বিরোধই প্রধান। সে সঙ্গে গ্রন্থাগারের আন্তঃ প্রশাসনিক কাঠামোকে সুদৃঢ় করার লক্ষ্য অর্জনে কর্তৃপক্ষীয় শিথিল মনোভাব। যে জন্য পেশাদারী গ্রন্থাগারিকের অনুপস্থিতিসহ পেশাদারী প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মীর অভাব ও অপর্যাপ্ত শাসনিক কর্মচারী এবং সম্পদের অপ্রতুলতা। ব্যাপক আমদানী ও বৈদেশিক মুদ্রার অভাব ও সীমাবদ্ধতা, অপরিমিত আর্থিক ব্যয় বরাদ্দ, অন্যান্য সুযোগ্য-সুবিধার অভাব। সর্বোপরি যোগ্য গ্রন্থাগারিক নিয়োগে ব্যর্থতার জন্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার আজকের এ পর্যায় ও পরিণতির জন্যে দায়ী।

অন্যদিকে মানব সম্পদের ব্যবহারিক উৎকর্ষ সাধন নিমিত্ত শিক্ষা গবেষণা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের মৌলিক লক্ষ্যকে বাস্তবায়িত করার জন্যেই গ্রন্থাগার। প্রয়োজন মেটানোর লক্ষ্যে গ্রন্থাগারকে বিন্যাস করতে হয় নির্দিষ্ট নীতি ও পরিকল্পনা অনুযায়ী। অনুষদ সদস্য, ছাত্র, গ্রন্থাগার কমিটি ও কর্মীদের সমন্বয়ে নিরূপিত হবে নীতিমালা। পরিকল্পনা গৃহীত হবে বাস্তবানুগ নীতির ভিত্তিতে। সমন্বয়ের অভাব হলেই গৃহীত নীতি ও পরিকল্পনা ব্যর্থ হবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে প্রকৃত সমন্বয়ের অভাব। সেজন্যে গৃহীত পরিকল্পনা ও নীতি সাফল্য লাভ করে না। ফলে একদিকে প্রশাসনিক ব্যর্থতা ও কোন্দল অন্যদিকে সেবাদানের ক্ষেত্রেও নিরুৎসাহিত ও ব্যর্থতা পরিলক্ষিত হয়।

উল্লেখযোগ্য যে, এদেশের গ্রন্থাগার পথিকৃত মরহুম এম, এইচ খান সাহেব অবসর গ্রহণের পর আজোবধি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে কোন পেশাগত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিককে নিয়োগ করা হয়নি। বিভিন্ন সময়ে কর্তৃপক্ষ পদটিকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছেন। খেলাটা অনেকটা খোলা মাঠে ছুট দেয়ার মত। আর অবস্থাটা দাঁড়িয়েছে মাঝি ছাড়া নৌকার মতই। সুতরাং মাঝি ছাড়া নৌকা চলতে পারে না। যদি চলেও গন্তব্যের সন্ধান কোন কালেও পাবে না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারেরও গন্তব্যের শেষ নেই। চলছেই নিরুদ্দিষ্টের পথে।

প্রফেসর ফিসউইকের উক্তিটিকে যথাভাবে মেনে নিয়ে বলা যায় তাই আমাদের জন্যে দুঃখজনক। একটা গ্রন্থাগার সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা যায় না। কিন্তু বিলাসবহুল ফাইভ ষ্টার হোটেল রক্ষণাবেক্ষণ করা যায় নির্দ্বিধায় কোন ত্রুটি ছাড়াই। দেশের মান যাবে যে। খদ্দেরের ঘাটতি হবে। কিন্তু একটা সচ্ছল গ্রন্থাগারের অভাবে যখন ভাবৎ জ্ঞানীরা-পণ্ডিতরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়, নিরাশায় জীবনে হতাশা নেমে আসে, সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করার দরকার কি আদৌ আছে? সর্বোপরি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের বর্তমান অবস্থার জন্যে এর ব্যবস্থাপনা পরিচালনার ক্ষেত্রে অবহেলা হতাশ করে। নীতি ও পরিকল্পনার অভাব। ডানে-বাঁয়ে না তাকিয়ে কলুর বলদের মতো টেনেই যাচ্ছে যেনো। আধুনিকতার ব্যবস্থা ও পদ্ধতি অনুসৃত হয়নি গ্রন্থাগারে। আধুনিক গ্রন্থাগার সার্ভিসে সেগুলো নিতান্তই অচল। পরিবর্তন দরকার জাতির স্বার্থে। যান্ত্রিকীকরণের ভিত্তিতে আধুনিক কৌশলে সার্ভিসদানের ব্যবস্থা শিগগিরই চালু করা দরকার। গ্রন্থাগারের পরিবেশ শিক্ষা গ্রহণ উপযোগী করা এবং ব্যবহারকারী যাতে গ্রন্থাগারমুখীন আকর্ষণ বোধ করে এরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের উচিত।

জাতির শিক্ষার মেরুদণ্ডকে পরিপক্ক করার জন্যে, সাহিত্য-সংস্কৃতি ও ইতিহাসের ঐতিহ্যকে সজীব রাখার জন্যে গ্রন্থাগারের আমূল সংস্কার অপরিহার্য। আধুনিক গ্রন্থাগার প্রযুক্তির প্রায়োগিক উৎকর্ষ সাধনের ভিত্তিতে গ্রন্থাগারের প্রকৃত ভূমিকাকে তুলে ধরতে হবে। বর্তমান অচল অবস্থা নিরসনের স্বার্থে পেশাজীবীদের নৈপুণ্যসাধনের জন্যে কারিগরি ও পেশাগত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ, বিশেষীকরণের মাধ্যমে সার্ভিসদানের ব্যবস্থা প্রবর্তন করা অনস্বীকার্য।

জাতি গতিশীলতা প্রত্যক্ষ করতে চায়--স্থবিরতা নয়। ঐতিহ্যের উত্থান চায়--নিশ্চয়ই পতন নয়। কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের বন্ধ্যাত্বতায় জাতি বিমূঢ়। বাংগালী জাতির ঐতিহ্যের ধারক, কৃষ্টি ও সভ্যতার প্রতিভূ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের আলোকোজ্জ্বল দীপ্তিময় ভূমিকা প্রত্যক্ষ করার জন্যে জাতি আজ প্রত্যাশী।